ভোরের কাগজ
19 FEB 2003
৬/৬

শিক্ষা মহিলাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে

গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে শিক্ষার গতি। সাংসারিক টানাপড়নের কারণে এক সময় যাদের কাছে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো ছিল সাধ্যের বাইরে। নিজেকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার চিন্তা ছিল স্বপ্নেরও অতীত, সেই গ্রামীণ মহিলারাই আজ আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জন করছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা। তারা এখন সন্তানদের স্কুলে পাঠাচ্ছে। তাগিদ অনুভব করছে নিজেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার। যা আমাদের দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ার গতিকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে বাড়ছে শিক্ষার হার। যা আমাদের জন্য খুবই ইতিবাচক একটি দিক। এ অবস্থা চলতে থাকলে সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যখন এ দেশের প্রত্যেকটি মানুষ হবে শিক্ষায় আলোকিত। অবহেলিত নারীরা শিক্ষা, আলোয় আলোকিত না হোক অন্তত অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদে উন্নীত হবে। গাজীপুর জেলার সালনা এলাকার বাস্তব চিত্র প্রমাণ করছে, অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল নারী একদিকে যেমন নিজেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তেমনি সন্তানদের পাঠাচ্ছে শিক্ষালয়ে। সালনার বেবী বেগম, রাহেলা খাতুন ও উষা রানীরা শুনালেন কিভাবে তারা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জন করেছেন। নিজেকে এবং সন্তানদের কিভাবে শিক্ষার প্রদীপের আলোয় আলোকিত করছেন। সালনা এলাকার বেবী বেগম শোনালেন তার কাহিনী। ২ সন্তানের জননী বেবী বেগম। স্বামী মসজিদের মুয়াজ্জিন। তার আয়ে সংসার চলছিল না। প্রায়ই চুলায় হাঁড়ি উঠতো না। স্বামীকে অন্যের দয়া-দাক্ষিণের ওপর নির্ভর করতে হতো। তা বেবী বেগমের চোখে ভালো লাগতো না। সন্তানের ভবিষ্যতের চিন্তায় তাকে উদ্বিগ্ন দেখা যেতো। এরূপ অবস্থার মাঝে পাশের বাড়ির শাহিদা বেগম তাকে শোনালেন– এলাকায় দুস্থ মহিলাদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সাহায্য সংস্থা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বেবী বেগম তার কথামতো স্থানীয় ব্র্যাক, প্রশিকা, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। অবশেষে বেবী বেগম 'আশা'র সদস্য হয়ে যান। সদস্য ভুক্তির ৪ সপ্তাহ পর আশা থেকে ৫ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকা দিয়ে ৫০টি ফার্মের মুরগি, ২০টি হাঁস কিনে গড়ে তোলেন হাঁস-মুরগির খামার। কিছুদিন পর হাঁস-মুরগি ডিম দিতে শুরু করে। ডিম বিক্রি করে অর্জিত আয় বেবী বেগমের দুঃখ ঘোচাতে শুরু করে। এ খাত থেকে তার দৈনিক আয় ৮০ থেকে ৯০ টাকা, যা খরচ বাদে মাসিক হিসাব দাঁড়ায় ১ হাজার ৮০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকা। বেবী বেগমের ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে সমস্যা হয় না। বড়ো ছেলেকে স্কুলে পড়ার খরচ চালাতে তেমন বেগ পেতে হয় না। বরং ছেলের জন্য গৃহশিক্ষক রেখে দেন। ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধের পর বেবী বেগম আশা থেকে আরো ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। এ টাকা দিয়ে তিনি মুরগির ফার্মের জন্য আলাদা ঘর তোলেন। সেখানে তিনি মুরগি পালনের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তার ফার্ম থেকে মাসিক আয় হতে থাকে ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। যা ২০০০ সালের কথা। তখন থেকে তার জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বদলে যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি– একটু সচেতনতা ও শিক্ষার আলো থাকলে যে কেউ গড়তে পারে নিজের ভাগ্য। যে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে বেবী বেগম ধ্বংস করতে বসেছিল তার সন্তানের অনাগত ভবিষ্যৎ। আজ বেবী বেগম তার সন্তানের জন্য উন্নত সুদিনের স্বপ্ন দেখেন। ছোট মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন এ বছর। বেবী বেগম বলেন, নিজের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল না বলেই স্বামীর ওপর মুখাপেক্ষী থাকতে হতোথ– যখন জানতে পারলাম আমরা নারীরাও পারি অর্থ উপার্জন করতে। সন্তানের ভবিষ্যৎ শুধু স্বামীর আয়ে নয়– আমাদের আররো একধাপ এগিয়ে নিতে।' বেবী বেগম আর নিরক্ষর থাকতে চায় না, সে বড়ো ছেলের কাছে অক্ষর জ্ঞান শিখছে। আজ সে টিপসই দেয় না, স্বাক্ষর দিতে শিখেছে। স্বামী এ ব্যাপারে তাকে সহায়তা করেন। গ্রামের আরেক মহিলা রাহেলা বেগম ছাগল পালন করে দারিদ্র্য থেকে মুক্তির স্বপন দেখছেন। তার খামারে রয়েছে ৪০-৪৫টি ছাগল। রাহেলা খাতুন ১৯৯৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ৬ হাজার টাকা ঋণ নেন। ঋণের টাকা দিয়ে ক্রয় করেন ৩টি ছাগল। শুরু করেন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই। সে লড়াইয়ে রাহেলা খাতুন একাই জয়ী হননি। তার তিন সন্তান লেখাপড়া করছে। রাহেলা খাতুন স্বপ্নেও ভাবতেন না তার সন্তান স্কুলে যাবে। যেখানে দুবেলা অন্ন সংস্থানই দুষ্কর ছিল। বড়ো মেয়ে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে। যেখানে তার বাল্যবিবাহ হওয়ার কথা ছিল। আজ অর্থনৈতিক সচ্ছলতায় তাকে সচেতন করেছে।

সেই সচেতনতার আলোকে মা সন্তানকে শিক্ষায় আলোকিত করছে। রাহেলা খাতুনও বসে নেই। তিনিও একটি এনজিও-পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছেন। তাদের গ্রামের আরেক মহিলা উষা রানী স্বামী মারা যাওয়ার ফলে এক সন্তান নিয়ে ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আশা থেকে প্রথম পর্যায় ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মুদি দোকান খোলেন। উষা রানী দোকানে পান থেকে শুরু করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করেন। তার দোকান থেকে মাসিক আয় আড়াই হাজার থেকে ৩ হাজার টাকা। উষা রানী ঋণের কিস্তির টাকা লাভের অংশ থেকে পরিশোধ করেন। উষা রানী তার সন্তান বিজয়কে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তার ভাইয়ের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত করেন। সে নিজেসহ গ্রামের অন্যান্য মহিলাকে নিয়ে রাতে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উষা রানী বলেন, 'আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রয়োজন আছে। যে মহিলার জীবনে সামান্য হলেও শিক্ষার আলো পৌছেছে, সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না। সে তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় শিক্ষিত করে তুলবে। সে সন্তানের আয় উন্নতির পাশাপাশি বাড়বে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হার। যে শিক্ষার্থীরা এক সময় জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করবে।'

বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা গ্রামীণ এসব মহিলার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বেসরকারি সাহায্য সংস্থা আশার সারা দেশে রয়েছে ১ হাজার ১৭২টি ব্রাঞ্চ। সদস্য সংখ্যা ২১ লাখ ৩৬ হাজার ১৬৫ জন। আশার ৭৪৫ জন কর্মী সারা দেশে ২৬টি ডিভিশনে বিভক্ত হয়ে ১৪৯টি অঞ্চলের ৩২ হাজার ৩৪৪টি গ্রামের মহিলাদের ভাগ্য-উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রমের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত প্রসার ঘটছে। মহিলারা বর্তমানে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে। তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও অবদান রাখবে। যা অর্থের অভাবের কারণে এক সময় মহিলারা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে সক্ষম হতো না। কিন্তু এখন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা তাদের সঙ্গে থাকায় ছেলেমেয়েদের তারা এখন স্কুলে পাঠান। যা দেশের জন্য খুবই ইতিবাচক দিক।

❑ মামুন আব্দুল্লাহ